Vol. 54 | No. 3 | 2017

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কবিতায় স্বদেশ ও স্বাধিকার

Volume	54
Issue	3
Year	2017
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Tariq Manzoor
Published online	June 1, 2017
DOI	10.62328/sp.v54i3.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v54i3.5
Pages	৯৭-১২৬
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কবিতায় স্বদেশ ও স্বাধিকার

তারিক মনজুর*

সারসংক্ষেপ : কবি হিসেবে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর উত্থান ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। ৪৭-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতিতে তিনি পরোক্ষ-প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। সময়ের বদলে রূপান্তর ঘটে স্বদেশের রূপ ও রাজনীতির, পরিবর্তন ঘটে অধিকার আদায়ের বিষয় ও ভঙ্গির। স্বদেশ ও স্বাধিকার – এই দুই উপাদানের সঙ্গে যুক্ত থাকে ব্যক্তি ও সমষ্টি-মানুষের মনো-সামাজিক নানা স্তর। এই লেখায় স্বদেশ ও স্বাধিকার সম্পর্কে কবির অবলোকন ও উপলব্ধিকে তুলে ধরা হয়েছে।

কবিতা ধারণ করে সময়কে – কবির প্রয়াস থাকে অতীতের সঙ্গে একে সংযুক্ত করে তার অন্য প্রান্তকে ভবিষ্যতের দিকে প্রবাহিত করার। এই সংযোগ-বিচ্ছিন্নতা কবিকে যুগোত্তীর্ণ হতে বাধা দেয়। যে কারণে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের অধিকাংশ রচনা কালিক আবেদনের সীমানা ভাঙতে পারেনি। বৃহত্তর মানবিক চেতনা, সূক্ষাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, আত্মোপলব্ধি, অধিকার সচেতনতা – এ সবই আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্য। যদিও কবিতার একটি ক্রমধারা আছে যা এক যুগ থেকে অন্যযুগে প্রসারিত এবং কোনো যুগের কাব্যই অন্য যুগের কাব্য থেকে পুরোপুরি বিশ্লিষ্ট নয় (আহসান, ২০০১ : ১৩), তবু আমাদের মানতে হবে পাশ্চাত্যের প্রভাব আমাদের কবিতার রূপ ও রীতির আকস্মিক বদল ঘটিয়েছে।

মধুসূদন দত্তের (১৮২৪–১৮৭৩ খ্রি.) *মেঘনাদবধ কাব্যে* রাবণের চোখে দেখা স্বদেশ আর হৃদয়ে ধারণ করা দেশপ্রেম অবশ্যই আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ; সেখানে স্বাজাত্যবোধ ও জাতীয়তাবাদ কবির অন্যতম উদ্দিষ্টও বটে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১–১৯৪১ খ্রি.) কবিতায়ও স্বাধিকারের প্রসঙ্গটি এসেছে; তবে প্রকট হয়ে দেখা দেয়নি – প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে তাঁর কবিতার মোড় পরিবর্তনকে মাথায় রেখেই এ কথা বলা যায়। এঁদের পূর্ববর্তী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৯১২–১৮৫৯ খ্রি.) মধ্যে

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

স্ববিরোধিতা লক্ষ করা গেলেও রাজনীতি ও অধিকার সচেতনতায় তিনি অনেক বেশি স্বচ্ছ :

রূপা সোনা সব গেল জাহাজেতে ভেসে।
কার কাছে ধার পাব টাকা নাই দেশে ॥ (গুপ্ত, ১৯৯৮ : ২৭৭)

এ রকম অনেক উদাহরণ ঈশ্বরগুপ্ত থেকে তুলে আনা যেতে পারে – শিল্পগুণ বিচারে তার কতটুকু কালোত্তীর্ণ হতে পেরেছে, সেই জিজ্ঞাসা এখানে অবান্তর। যুগকে ধারণ করেও যে যুগ পেরুনো যায়, তার দৃষ্টান্ত তো কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯–১৯৭৬ খ্রি.) কবিতাতে রয়েছে :

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না –
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত। (নজরুল, ১৯৯৩ : ১০)

বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে বাংলা কবিতায় আন্তর্জাতিকীয় স্বাদ অনুভূত হতে থাকে। হতাশা, বিচ্ছিন্নতা, একাকীত্ব এ সময়ের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কবিতার ভাষাও দুর্বোধ্য হতে শুরু করে। আধুনিক বাংলা কবিতায় ধারায় তিরিশের কবিদের অবদান ও অবস্থান নানা কারণে বিশিষ্ট। রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে নয়, রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিনীত থেকেই তাঁদের কাব্যরচনার সূচনা। এ কথা অস্বীকার করার উপায় বা প্রয়োজন নেই যে, রবীন্দ্র-কাব্যবলয়ের বহির্গামী মানসিকতারই প্রত্যক্ষ ফসল 'আধুনিক কবিতা'। (খালেদ, ২০০০ : ১০) কালিক বিদ্রোহে এর সূত্রপাত হলেও বিপুল ঐশ্বর্য নিয়ে তা অফুরন্ত সম্ভাবনা এনে দিয়েছে।

তিরিশের উচ্চাভিলাষী কবিদের দ্রোহ-মেধা-শ্রমে নির্মিত পথ বেয়ে চল্লিশের দশকে আবির্ভূত হলেন অনেকেই, অসংখ্য বলা হয়তো অসঙ্গত হবে, তবে এত অধিক সংখ্যক কবি এর আগে কখনোই পরিলক্ষিত হয়নি। (প্রণবেন্দু, ১৯৮৩ : ১২৫) এঁদের অধিকাংশই সামাজিক দায়বদ্ধতাকে কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ঔপিনেবিশক শাসনের গ্লানিজনিত অস্থিরতা তাঁদেরকে গ্রাস করলেও দ্ব্যর্থবোধক শব্দ আর প্রতীকী ব্যঞ্জনায় চল্লিশের কবিরা অধিকারের কথা বলতে শুরু করলেন :

ক. আমি রোমান্টিক কবি নই, আমি মার্ক্সিস্ট।
... ...
দুকোটি ক্ষুধার অভিশাপ
সংহত বাঙলা দেশে।

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই,
নিবিড় মিতালি মহাজন ও শকুনে।
[সমর সেন : '২২ শে জুন', *সমর সেনের* কবিতা]

খ. কমরেড আজ নবযুগ আনবে না?
কুয়াশাকঠিন বাসর যে সম্মুখে।
লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা –
দলে টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে,
কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?
[সুভাষ মুখোপাধ্যায় : 'সকলের গান', *পদাতিক*]

গ. কাস্তে দাও আমার এ হাতে
সোনালী সমুদ্রে সামনে, ঝাঁপ দেব তাতে।
[সুকান্ত ভট্টাচার্য : 'ফসলের ডাক : ১৩৫১', *ছাড়পত্র*]

সর্বসাধারণের কাছে স্বাজাত্যবোধের সরলীকৃত মানে ছিল 'ইংরেজ খেদানো'; আর অধিকাংশের কাছে 'অধিকার'-এর সমার্থক হয়ে দাঁড়াল সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদ – যেমনটি সাধারণত হয়ে থাকে – পরাধীন রাষ্ট্র স্বপ্ন দেখায় 'স্বাধীনতা' তাদের সবাইকে খেয়ে পরে বাঁচার সুযোগ করে দেবে। সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় কিংবা সুকান্ত ভট্টাচার্য – এঁদের কবিতায় যে অধিকারের কথা উঠে এসেছে তা সচেতনভাবেই প্রযুক্ত। চল্লিশের দশকে বাংলাদেশের রাজনীতি-শিল্পসংস্কৃতিতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দোলাচল, দ্বন্দ্ব-সংক্ষোভ ও বিপর্যয়ের ফলে ঐ প্রসৃত রূপটি নানারকম স্ববিরোধী-বৈশিষ্ট্য লাভ করে। বিশেষত ১৯৪২-৪৫ সালে ব্যাপক সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে মার্কসীয় চিন্তাদর্শের যে বলয় গড়ে উঠেছিল, তার প্রভাব সমাজমানসে অনুভূত হতে থাকে। (আকতার, ১৯৯২ : ৭৯) রাজনৈতিক আদর্শকে কবিতায় প্রয়োগের ব্যাপারটি নজরুলের কবিতায়ও ব্যাপকভাবে ঘটেছে, কিন্তু সমর-সুভাষদের প্রেরণা ছিল বিষ্ণু দে (১৯০৯–১৯৮২)। এ সময়কার কবিদের কবিতায় স্বদেশচেতনা পরিগৃহীত হয় একটি মূল 'থিম' রূপে, যদিও সে অভিজ্ঞতার ধরন ছিল বিপর্যয়কর – পঞ্চাশের মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ স্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

১৯৪৭-এর দেশবিভাগ কলকাতা ও ঢাকা-কেন্দ্রিক দুটি পৃথক কবিতা-তীর্থের জন্ম দেয়। কিন্তু পূর্ববাংলার কবিতার বিপুল স্ফুরণ ঘটিয়েছে বাহান্নর ভাষা আন্দোলন। ভাষার প্রতি মমত্ববোধ প্রতিটি জাতির সহজাত প্রবণতা; '৫২-তে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজনীতি – ফলে '৫২ হয়ে উঠেছে স্বাধিকারের উচ্চারণ। ভাষা-বিষয়ক সতের ও উনিশ শতকের দুটি কবিতা লক্ষ করা যাক :

১. যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ॥
[আবদুল হাকিম : 'যে সব বঙ্গেত জন্মি', *নূরনামা*]

২. নানান দেশের নানান ভাষা
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা ॥
[রামনিধি গুপ্ত : 'স্বদেশী ভাষা', *ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালী ও বাংলা সাহিত্য*]

কবি আবদুল হাকিম (আনুমানিক ১৬২০–১৬৯০ খ্রি.) কিংবা রামনিধি গুপ্তের (১৭৪১–১৮৩৮ খ্রি.) মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ভাষা-আন্দোলনের চেতনা অনুপস্থিত ছিল। ভাষার জন্য রক্তদানের ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে অভূতপূর্ব। 'রক্ত' বাংলা সাহিত্যে নেতিবাচক ও ইতিবাচক – উভবিধ প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হলেও ভাষা-শহিদদের রক্তদানের ঘটনার পর তা মূলত অধিকার-সংগ্রাম-উজ্জ্বলতা ও স্ফুরণের সংকেতবহ হয়ে উঠল। একইসঙ্গে আমাদের কবিতায় 'ভাই' হয়ে উঠল আত্মিক সম্পর্কযুক্ত পরিজন। মা-এর সঙ্গে মাটি ও মাতৃভূমির পূর্বাপর সম্পর্ককে বজায় রেখে তা নব-তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠল।

আন্দোলনে উজ্জীবিত বা নিহত ছেলের মা একদিকে হয়ে উঠল অশ্রুসজল ও বেদনাসিক্ত এবং অন্যদিকে গৌরবান্বিত ও রত্নগর্ভা। মা-এর এই রূপটিকে উনিশশ একাত্তর পরবর্তী কবিতা পর্যন্ত বিস্তৃত দেখতে পাই। পার্থক্য এটুকুই যে স্বাধীনতা-যুদ্ধের সর্বব্যাপী আলোড়নে মায়ের ছবিটি বিস্তার লাভ করেছে।

উনিশশ সাতচল্লিশের দেশবিভাগ এবং বাহান্নর ভাষা-আন্দোলন বাংলা কবিতার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। স্বাজাত্যবোধের প্রাবল্য এবং ঐতিহ্যিক অনুষঙ্গ এ সময়ের বাংলা কবিতাকে চলিষ্ণুতা দান করেছে। 'বাংলাদেশের সাহিত্য' অভিধায় চিহ্নিত ধারাটি বাংলা সাহিত্যে আজ দৃঢ় অবস্থান করে নিয়েছে; কিন্তু এ ধারাটি সৃষ্টির পশ্চাতে রয়েছে রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পালাবদলের ইতিহাস। (কাহালি, ১৪০৭ : ৮৩) তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হল, যখনই কোনো বৃহত্তর আন্দোলন-সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছে, বাংলা কবিতার ভাষাও সেই অনুসারে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। অন্যসময় কবিরা নিমগ্ন হয়েছেন অন্তর্জগতে। সময়ের অভিঘাত যে ব্যক্তিক অনুভূতির চেয়ে প্রবলতর, এখানে সেই সত্যটিই প্রতিপাদিত হয়।

২

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ তাঁর কাব্য-প্রয়াসের শুরু থেকেই স্বদেশ ও স্বাধিকারের কথা শুনিয়েছেন। নিঃসন্দেহে তাঁর কাব্যপ্রেরণা তাঁর মা, পরবর্তী সময়ে তাঁকে উৎসাহিত

করেছেন একুশের প্রথম সংকলক হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩); কিন্তু ওবায়দুল্লাহর স্ফুরণ ঘঠেছে বাহান্নর ভাষা-আন্দোলনেই। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি দশজন দশজন করে যে মিছিল বেরিয়েছিল তাতে প্রথম দিকের মিছিল থেকেই তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। (মেনন, ২০০৩ : ৯৫) প্রত্যক্ষ আন্দোলন-সংশ্লিষ্টতা তাঁর লেখার গতিপথ তৈরি করেছে – এ কথা বলা মোটেও সঙ্গত হবে না; বরং এটুকু বলা যায় – একুশের ঘটনা তাঁর সংবেদনশীল মনকে প্রভাবিত করেছে। *একুশে ফেব্রুয়ারী*[১] (১৯৫৩) সংকলনে স্থান পাওয়া আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কবিতাটি[২] তাঁর অপরিণত বয়সের[৩] রচনা হলেও প্রকরণগতভাবে এটি মোটেও দুর্বল নয়, উপরন্তু তাঁর সমগ্র সৃষ্টি-সম্ভারের মৌল প্রবণতাকে নির্দেশ করে দিয়েছে :

> "কুমড়ো ফুলে ফুলে
> নুয়ে প'ড়েছে লতাটা,
> সজ্‌নে ডাঁটায়
> ভরে গেছে গাছটা,
> আর আমি
> ডালের বড়ি শুকিয়ে রেখেছি।
> খোকা, তুই কবে আসবি?
> কবে ছুটি?"
> চিঠিটা তার পকেটে ছিল
> ছেঁড়া আর রক্তে ভেজা। (ওবায়দুল্লাহ, ১৯৯৯ : ৩০)

কবিতার এ-অংশের মধ্যে তিনটি বিষয় লক্ষণীয় : ক. সহজ ভঙ্গি, খ. গ্রামীণ উপকরণ, গ. মায়ের উত্থান। এবার অন্য একটি অংশ দেখা যাক :

> "খোকা এলি?"
> ঝাপ্‌সা চোখে মা তাকায়
> উঠানে উঠানে
> সেখানে খোকার শব
> শকুনীরা ব্যবচ্ছেদ করে।
> এখন
> মা'র চোখে চৈত্রের রোদ
> পুড়িয়ে দেয় শকুনীদের। (ওবায়দুল্লাহ, ১৯৯৯ : ৩১)

এখানে নিশ্চিতভাবে কবি প্রতিবাদী, অধিকার সচেতন। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ তাঁর পরবর্তী সময়ের কবিতায় এইসব বৈশিষ্ট্যকে পুরোমাত্রায় গ্রহণ করেছেন। সারল্য,

লোকজ উপাদান, আর অধিকার আদায়ের শোভন উচ্চারণ তাঁর কবিতাকে বিশিষ্ট করেছে। তাঁর কবিতায় চটুল-চপল ভঙ্গি এবং ছড়ার ছন্দ তাঁকে আলাদাভাবে চিনিয়ে দেয়। তবে অন্নদাশঙ্কর রায় কিংবা অজিত দত্তের ছড়া যেমন একইসঙ্গে অনেক সময় শিশু ও বয়স্কভোগ্য, তেমন নয় আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কবিতা। (মান্নান, ২০০৩ : ৬৯) তাঁর লক্ষ্য প্রাপ্তবয়স্ক পাঠক ও পরিণত মন। তাঁর শেষ দিককার কবিতাগুলোতে এই স্বাচ্ছন্দ্য, চপলতা ও ছন্দোময়তা ব্যাহত হয়েছে অনেকখানি; কিন্তু অতিরিক্ত শব্দভারে পঙ্‌ক্তিগুলো দীর্ঘ হয়ে ওঠেনি। ক্যামেরায় তোলা স্থিরচিত্রের মতো বিচ্ছিন্ন ছবি এঁকেছেন :

সবুজ অন্ধকার
হিজলের নদী
শিকড়ে হরিণ শিশু
শতজলঝর্ণার ধ্বনি – (ওবায়দুল্লাহ, ১৯৯৯ : ১৫২)

এগুলোকে জোড়া দিয়ে এখন পূর্ণ দৃশ্যপট তৈরি করতে হবে। শুধু তাই নয় কবির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্য পাঠককেও নিমজ্জিত হতে হবে কবিতার গভীরে। যদিও কবির ভাব আর পাঠকের ভাবনা সবসময় এক হবে, এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু কবি ওবায়দুল্লাহ তাঁর শেষের কবিতাগুলোয় ক্রমশ দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছেন – প্রাজ্ঞ পাঠকের শ্রদ্ধা বাড়লেও সাধারণ পাঠকের সাহানাভূতি কমেছে। 'ক্রমশ দুর্বোধ্য' বলতে মোটেও 'অবোধগম্যতা'কে বোঝানো হচ্ছে না; প্রকৃত অর্থে, অনেক আধুনিক কবির চাইতে তাঁর লেখা সরল, তবে প্রথম দিককার কবিতাগুলোর সঙ্গে মেলালে এই পার্থক্য ধরা পড়ে। ফলে তাঁর নিয়মিত পাঠকদেরকে হোঁচট খেতে হয়।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ আরো একবার পাঠকদেরকে হোঁচট খাইয়েছিলেন কিংবদন্তি আর বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের কথা শুনিয়ে – পাঠক-শ্রোতা বিস্ময় ও মুগ্ধতার সঙ্গে শুনিছে তাঁর দীপ্ত উচ্চারণ :

আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরষের কথা বলছি।
তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল
তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল।
তিনি অতিক্রান্ত পাহাড়ের কথা বলতেন
অরণ্য এবং শ্বাপদের কথা বলতেন
পতিত জমি আবাদের কথা বলতেন
তিনি কবি এবং কবিতার কথা বলতেন।

জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ কবিতা
কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা। (ওবায়দুল্লাহ, ১৯৯৯ : ৯৫)

কিংবা

পাখিরা বসতে পারে এমন কোন বৃক্ষ নেই
জোনাকি লুকাতে পারে এমন কোন গুল্ম নেই
সূর্য শীতল হবে এমন কোন নদী নেই
এবং আমার বিচিত্র শব্দাবলী বিবর্ণ
বৈশাখের শিলাপাতে আহত শস্যের মত বিচূর্ণ। (ওবায়দুল্লাহ, ১৯৯৯ : ১০৩)

কবির তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠ এবং কবিতার দুর্দান্ত প্রবহমানতা কেবল কবি-ভক্তদের চমকে দেয়নি, দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে অন্যদেরও। এই কবিতা পড়ে পশ্চিমবঙ্গের কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ রচিত মন্ত্রে আমি এমনই তন্ময় হয়ে পড়েছিলুম যে ঘোর কাটতে আমার বহু কষ্ট লেগেছে। এ কি বাংলা ভাষা। এ ভাষায় কি কবিতা রচনা সম্ভব? বিশেষ করে, মারপ্যাঁচ-অলা লেখা যখন সংক্রমক, তখন?' শক্তি চট্টোপাধ্যায় আরো লিখেছেন, 'আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কবিতা মন্ত্রের মতো অমোঘ, শুদ্ধ, সত্যবান। এরকম কবিতা আমি বাংলা ভাষায় আগে কখনো দেখিনি। স্তম্ভিত হচ্ছি ওবায়দুল্লাহর এই ঘোর-লাগা সরল অথচ অনিবার্য উচ্চারণে।' পশ্চিমবঙ্গের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, 'তাঁর কবিতায়, কোথাও কোথাও এমন মন্ত্রের মতন গাম্ভীর্য এসেছে যে মনে হয় তিনি গদ্য-শ্লোক নির্মাণ করতে চান।'[৪] সুসাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ও তাঁকে স্বহস্তে লিখে জানান, 'আপনার কবিতা আমার চমক লাগিয়েছে।'

যারা আগে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহকে চিনত না, তারা 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' আর 'বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা' এই দুটি কবিতা পড়ে, সেইসঙ্গে কবিতার ক্যাসেট 'তাম্রলিপি'র[৫] আবৃত্তি শুনে যারপরনাই মুগ্ধ ও বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়েছে। তবে, বোধ করি, অনেকেই বিভ্রান্ত হয়েছে এই কবিতার সূত্র ধরে তাঁর পূর্বাপর কবিতাগুলো পড়তে গিয়ে। স্তোত্রতুল্য মন্ত্রতা ও নির্দ্বন্দ্ব-অবাধ গতি কবিতা দুটির প্রধান বৈশিষ্ট্য সন্দেহ নেই; কিন্তু বিষয়গুণেও এগুলো অফুরন্ত প্রাণস্পর্শী হয়েছে : সুদূর অতীত থেকে বহমান সময়কে তিনি মানুষের অস্তিত্বের লড়াই ও সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে নিরবিচ্ছিন্ন করে দেখিয়েছেন। এ বিবেচনায়, এ দুটি দীর্ঘ কবিতা আন্তর্জাতিক মাত্রা পেয়েছে।

বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা কাব্যগ্রন্থে এই দুটি দীর্ঘ কবিতা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো জ্বলে উঠেছে – অবশ্যই অন্য কবিতাগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, তবে সেগুলোকে ম্লান করে দিয়ে নয়। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার হল, এই কাব্যগ্রন্থটি

তাঁর কাব্য-প্রয়াসের শ্রেষ্ঠ সময়ের রচনা – এর আগের এবং পরের কবিতাগুলোয় ভিন্ন স্বাদ পাওয়া যাবে। 'সহজ' এবং 'ক্রমশ দুর্বোধ্য' বলতে যে টার্মটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার বিভাজন-রেখা হিসেবে অবস্থান করছে *বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা*।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ তাঁর কবিতায় স্বদেশকে অবলোকন করেছেন পূর্ণ রূপ ও ঐশ্বর্য সহকারে। কিন্তু সুবিধাভোগী শ্রেণির প্রসারিত থাবা আর সময়ের অভিঘাতে সেই সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি বহুলাংশে হারিয়েছে এবং ক্রমশ তা হারাতে বসেছে। এর প্রতিবাদে কবি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা মোটেও বজ্রকঠিন নয়; তবে স্পষ্টভাবে তা অধিকার আদায়ের ভাষা। অন্তত সে অধিকার যে নিজের – এই বিশ্বাসটুকু কবি সঞ্চারিত করে দিতে পারছেন পাঠকের মধ্যে। খুবই সহজ ভঙ্গিতে স্বজনের কথা বলেছেন। তিনি যখন মন্ত্রী ছিলেন, তখন তাঁর ছোট ভাই রাশেদ খান মেননকে রাজনৈতিক আন্দোলনের দায়ে ধরে নিয়ে গেলে গভীর বেদনায় লিখেছেন : 'মায়ের কবরের মতো চুপ করে থাকি।' নির্বাক দর্শকের ভূমিকা নিলেও মেনন তাঁর কাছে সমাজের সব মানুষের প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছিলেন। আর তাই ভাইয়ের আত্মগোপনকালে লিখেছেন : 'এই শহরে যদি চাঁদ ওঠে, আলো ফোটে যদি দ্বীপ জ্বলে ওঠে তাহলে আমার ভাই গ্রেফতার হয়ে যাবে।'[৬]

কবিতায় ভাইয়ের উত্থান ঘটেছে মূলত ভাষা-আন্দোলনের সূত্র ধরেই। এই 'ভাই' হয়ে উঠেছে স্বৈরাচার-নিপীড়ক শাসকের প্রতিপক্ষ; অধিকার সচেতন ও সোচ্চার। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ তাঁর ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাকে সমষ্টিগত চেতনায় ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। যা কিছু তিনি করতে সক্ষম হননি পেশাগত কারণে, আত্মমুখীনতার জন্য – অথচ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন ছিল – সেগুলো অর্জন করার জন্য তিনি লিখে গেছেন। পৃথিবী বদলানোর অভিপ্রায়ে প্রথম জীবনে রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সঙ্গে জড়িত হয়েছেন – পুরো জীবন জুড়ে কমবেশি জড়িত থেকেছেন, কিন্তু আশানুরূপ সফল হতে না পারার ব্যর্থতা ও গ্লানি তিনি স্বীকার করেছেন।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর জন্ম ১৯৩৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। বনেদী, অভিজাত পারিবারিক পরিবেশ ও ঐতিহ্য তাঁর মানসগঠনে কাজ করেছে। পিতা আবদুল জাব্বার খান ছিলেন তদানিন্তন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পিকার। সহোদরদের মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শ ও দৃষ্টিকোণে বিভেদ থাকলেও যে সহাবস্থান ও পরমত-সহিষ্ণুতা ছিল, তা প্রশংসিত হয়েছে নানা সময়ে, নানা জনে। ছাত্রজীবনে তীক্ষ্ণ মেধার প্রমাণ রেখেছেন – মেট্রিকে দ্বিতীয় ও ইন্টারমিডিয়েটে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে পড়াশোনা করেছেন। ১৯৫৪ সালে এম.এ পাশ করার পর কিছুদিন অধ্যাপনা পেশায়ও নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৫৭ সালে সিএসএস পরীক্ষায় তখনকার পুরো পাকিস্তানে দ্বিতীয় হওয়ার গৌরব

অর্জন করেন। যোগ দেন সরকারি চাকরিতে; পরে হন সচিব, রাষ্ট্রদূত ও মন্ত্রী। জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থায় দায়িত্বও পালন করেছেন; কিন্তু কবিতাকে ভুলে থাকতে পারেননি।

ছাত্রাবস্থা থেকেই প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হয়েছেন, সংস্কৃতি সংসদের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন ছাত্র থাকাকালে। এই দেশে প্রথম দর্শনীর বিনিময়ে কবিতার অনুষ্ঠান চালু করে যারা, সেই সংগঠন 'পদাবলী'র তিনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি এই গভীর ভালোবাসা তাঁকে জনঘনিষ্ঠ করেছে, জনপ্রিয় করেছে। আবার কবিতাকে প্রাণাধিক ভালোবাসার দরুন তাঁর সংবেদনশীল মনে গভীরতম আঘাত সইতে হয়েছে : আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর বেদনাদায়ক বিদায়ের পিছনে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাকেই দায়ী করা হয়।

২০০০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি জাতীয় কবিতা উৎসবে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও 'এরশাদ সরকারের মন্ত্রী' হওয়ার কারণে তাঁকে কবিতা পাঠ করতে বাধা দেওয়া হয় – মঞ্চে উঠতে দেওয়া হয়নি, দাঁড়াতেও দেওয়া হয়নি। নিপাট ভদ্রলোকের মতো হেঁটে চলে গেছেন – প্রতিবাদকারী 'কবি'টির বিরুদ্ধে কোনো প্রতিশোধ না নিয়েই। ক্ষমতার মোহ, দম্ভ বা প্রতিশোধস্পৃহা তাঁর ছিল না। ছিল একটি সংবেদনশীল মন – বিক্ষত সেই মন সপ্তাহ দুয়েক স্থির ছিল : এরপর ১৫ই ফেব্রুয়ারি তিনি মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ রোগে (সেরিব্রাল হেমারেজ) আক্রান্ত হন। দীর্ঘ তের মাসেরও বেশি সময় অচেতন থাকার পর ২০০১ সালের ১৯শে মার্চ তাঁর প্রয়াণ ঘটে। আপাতদৃষ্টিতে খুবই সাধারণ একটি ঘটনা তাঁর চেতনায় কী গভীর রেখাপাত করেছিল তার প্রমাণ – ওই ঘটনার পর ৯ই ফেব্রুয়ারি 'দৈনিক ভোরের কাগজে' অর্থনীতি বিষয়ক তাঁর লেখা প্রবন্ধের সঙ্গে ছাপা হওয়া একটি ছোট্ট মন্তব্য। সেখানে কবি লিখেছিলেন : 'বহুদিন যে ভুবনে আমার পরিব্রাজনা; ফেব্রুয়ারির ১ তারিখে বেদনার্ত অবমাননার কারণে সে জগৎ থেকে সম্প্রতি অপসারিত। সুতরাং মান্যবর সম্পাদক, একটি সনির্বন্ধ অনুরোধ, আমার নামের পেছনে চিত্ররূপময় 'কবি' শব্দটি যেন মুছে ফেলা হয়।'[৭]

৩

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ তাঁর *কবিতাসমগ্র*র ভূমিকায় লিখেছেন, তিনি কেন লেখেন তা তিনি নিজেও জানেন না। কবিতা লেখা কবে থেকে শুরু, কেমন করে শুরু, তা এখন 'বিস্মৃতির পটভূমিকায় স্মৃতির জলের রেখা'। তবে তাঁর প্রিয় কবি – জন্মস্থান বরিশালের কবি জীবনানন্দ দাশের কতিপয় পঙ্‌ক্তি – 'জীবন ছাড়িয়ে কোনো মানবীয় অভিজ্ঞতা থাকা কি সম্ভব? কবির অভিজ্ঞতা যা আকাশ-পাতাল সমস্তই উপলব্ধি করে নিতে চায় তাওতো মানবীয়।' – এই সত্যটি তাঁকে আজীবন তাড়া করে ফিরেছে।

ওবায়দুল্লাহ মনে করেন, ঐ যে মানবীয় উপলব্ধি সেটি যখন ধ্বনির ওপরে ধ্বনি – তখনি গাঁথা হয় কবিতার মঙ্গলসূত্র। বিনয় করেই বলেছেন, 'তাকে কণ্ঠে ধারণ করবো আমার তেমন সাধ্য নেই। তবে নিস্ফল প্রয়াসের যে আনন্দিত বেদনা তাকে কখনো অস্বীকার করিনি।' বহুদিন আগের একটি ছড়া[৮] কেটে বলেন, 'আমার কবিতা আমার ভালবাসার স্বজনদের জন্য'।

এই স্বজনদের মধ্যে বারে বারে উঠে এসেছে তাঁর কৈশোরে হারানো মা – যে মা একান্ত তাঁর ব্যক্তিক হলেও ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিতে সংস্থাপিত হয়ে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এর আগেও বাংলা কবিতায় মা এসেছে; কিন্তু মায়ের সেই রূপ আর ওবায়দুল্লাহর কবিতায় ব্যবহৃত মায়ের নতুন প্রতীকটির মধ্যে বিভাজন গড়ে দিয়েছে 'অমর একুশে'। এই মায়ের সঙ্গে মাতৃভাষা গভীরভাবে অন্বিত হয়েছে; পূর্বেও এই অন্বয় ছিল, কিন্তু বাহান্নর সফল রাজনৈতিক চেতনা সেখানে পুরোপুরি অনুপস্থিত। একাত্তর-পরবর্তী কবিতায় মা কেবল বীরপ্রসূ থাকেনি, স্বাধীন স্বদেশ ও মুক্ত মাটির প্রতীকে উপস্থাপিত হয়েছে।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কবিতায় তাঁর ভাই এসেছে, বোন এসেছে, মায়ের প্রতিমূর্তি ধারণ করে এসেছে নিজের কন্যা। চারপাশের স্বজনরা যেমন উঠে এসেছে, তেমনি পরিবারের ছোট ছোট আনন্দদুঃখও তাঁর নজর এড়ায়নি। যদিও এসব অনুভূতি একান্ত ব্যক্তিগত; কিন্তু তাঁর কবিতায় যখন ব্যবহৃত হয়েছে তখন তা আর ব্যক্তিক থাকেনি – সমষ্টির চেতনায় প্রবাহিত হয়েছে।

কবিতা লেখার প্রেরণা হিসেবে তিনি বারে বারে দুজনের কথা বিশেষভাবে বলেছেন : একজন তাঁর মা – যিনি তাঁর সংসার খরচ বাঁচিয়ে কবিতা লেখার জন্য কলম কিনে দিয়েছিলেন; অন্যজন হাসান হাফিজুর রহমান – একুশের প্রথম সংকলক। মা তাঁর কৈশোরের কাঁচা লেখায় মুগ্ধ শ্রোতা আর হাসান হাফিজুর রহমান তাঁর প্রথম কবিতার বই *সাতনরী হার*-এর উদ্যোগী পৃষ্ঠপোষক। স্পষ্টত একজন অন্তর্জগতে ক্রিয়াশীল, অন্যজনের প্রভাব বহির্জগতে। শিল্পীর সৃজনাবেগ এবং সংস্কৃতকর্মীর দায়িত্ববোধকে যিনি সমতাৎপর্যে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, সেই হাসান হাফিজুর রহমান কবিদেরকে যে জাগিয়ে তুলতে পারতেন তার প্রমাণ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ।

কবিতায় আবু জাফর স্বদেশের যে ছবি এঁকেছেন তা একইসঙ্গে সমৃদ্ধ ও আক্রান্ত – অতীত ঐতিহ্য তাঁকে আনন্দ দেয়, গৌরবান্বিত করে, কিন্তু সমকালের সংকীর্ণতা ও করাল থাবা তাঁকে বিষণ্ন, অধিকার সচেতন করে তোলে। কবিতায় স্বাধিকারের কথা যখন উচ্চারণ করেছেন, তখনও তা দ্বৈত অর্থবোধক হয়ে উঠেছে – ব্যক্তিক ও সমষ্টিগত। কখনো উত্তাল রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে কবিতাকে সংশ্লিষ্ট করে ঐক্যবদ্ধ জাতির স্বাধিকারের কথা বলেছেন; কখনো স্থিত হয়েছেন আত্মমগ্নতায় –

তখন ব্যক্তির নিঃসঙ্গতাকে অবলোকন করেছেন আবার নিজের অস্তিত্ব নিয়েও জিজ্ঞাসিত হয়েছেন।

৩.১

প্রথম কাব্যগ্রন্থ *সাত নরী হার* (১৯৫৫)-এর অধিকাংশ কবিতা গ্রামীণ ছড়ার আদলে লেখা আধুনিক কবিতা। এগুলোকে পুরোপুরি 'ছড়া' বলা যায় না দুটি কারণে : প্রথমত ছড়ার অর্থহীনতা ও সহজবোধ্যতা এখানে অনুপস্থিত, দ্বিতীয়ত এর ভাব সুগভীর ও ভাষাভঙ্গি তির্যক। 'ছড়া'র একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল তা ছেলেবুড়ো সবার পাঠোপযোগী – কোনো বয়স-নির্ভর রচনা নয়। কিন্তু আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ যে কথাগুলো শুনিয়েছেন তা প্রাজ্ঞ পাঠকের উপযোগী। ফলে তাঁর কবিতাগুলো হয়ে উঠেছে ভিন্ন স্বাদের এবং আঙ্গিকগতভাবেই তা চোখে পড়ার মতো আলাদা। একটি সহজ ছড়ার ছন্দ তাঁর মধ্যে শুরু থেকেই ছিল এবং প্রায় তিন দশক এই প্রবণতা তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। *সাত নরী হার*-এর অনেক কবিতা রিকশায় করে বিশ্ববিদ্যালয় যাওয়ার পথে মুখে মুখে রচিত। (শামসুল, ২০০৩ : ৩৯)

দেশ-বিভাগোত্তরকালে পাকিস্তানের দুটি অংশের মধ্যে সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক – সব দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান ছিল পশ্চাদপদ, শোষিত ও অবহেলিত। অধিকার-সচেতন কবির দৃষ্টিতে তা এড়ায় না; তিনি ঠিকই লক্ষ করেন :

> এপারেতে লঙ্কা গাছে
> কয়লা কালো বেড়াল নাচে
> তিনটে বুড়ী উঁকুন বাছে
> হুতুম পেঁচা রাত;
> ওপারেতে মানিক জ্বলে
> পান্না-চুনির হাট।
>
> ['রূপকথা' : *সাত নরী হার*]

স্বাধিকারের চেতনাকে যদিও জাগ্রত করেছিল ভাষা-আন্দোলন, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থান্বেষী একচোখা দৃষ্টিভঙ্গি মুক্তি-সংগ্রামকে অনিবার্য করে তোলে। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হলেও জাতীসত্তার বিভাজন পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। যদিও সাম্প্রদায়িকভিত্তিক রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের সৃষ্টি, কিন্তু এর পিছনে বিরাট অর্থনৈতিক কারণ ছিল। জমিদার শ্রেণি এবং ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যেই পাকিস্তান আন্দোলন আরম্ভ হয়। তখন এই জমিদার, ব্যবসায়ী এবং পুঁজিপতিদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত।

সুতরাং আন্দোলনটি এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অন্য সম্প্রদায়ের আন্দোলনে পরিণত হয়। এর ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা বিদ্যমান থাকে। তাই লক্ষ করা যায়, তখন পাকিস্তানের শাসকবৃন্দ একই আদর্শ এবং একই সাংস্কৃতিক প্রজ্ঞার মধ্যে সমগ্র পাকিস্তানকে আবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। এর ফলে অল্প সময়ের মধ্যে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষীর সঙ্গে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। (আহসান, ২০০১ : ৪৭)

প্রথম সংঘর্ষ বাধে ১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। সমগ্র পাকিস্তানকে একক সাংস্কৃতিক গ্রন্থিতে আবদ্ধ করার অবাস্তব পরিকল্পনায় বাংলাদেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। হাজার বছরের প্রযত্নে গড়ে ওঠা সমৃদ্ধ বাংলা ভাষাকে ছেড়ে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙালিরা মেনে নিতে পারেনি। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হয়, সালাম-বরকত-রফিক-শফিক-জব্বারসহ নাম জানা-না জানা অনেকেই শহিদ হয়। পরবর্তী সময়ে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের আরেকটি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেওয়া হয় – একটি সফল আন্দোলন আমাদেরকে আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ় করে তোলে, আমাদের কবিতাতে আমূল পরিবর্তন আনে।[৯]

ভাষা-আন্দোলন আমাদেরকে একতাবদ্ধ হতে শিখিয়েছিল, আমাদের বাংলা কবিতাকেও দৃঢ় ও দীপ্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পেরেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে বিরোধ ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে আমরা অগ্রসর হতে থাকি এবং ধীরে ধীরে তা স্বাধীকার আন্দোলনে রূপলাভ করে। *সাত নরী হার* কাব্যগ্রন্থে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু টুকরো ছবি উঠে এসেছে :

১. কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে
আগুন লেগেছে
['রূপকথা-২' : *সাত নরী হার*]

২. ওই পাখাটার জন্যে
লড়াই চলে শূন্যে
['রূপকথা-৫' : *সাত নরী হার*]

৩. ঘরদোর তছনছ সব হয়রান
['ময়নার জন্য' : *সাত নরী হার*]

এই পঙ্‌ক্তিগুলোর মধ্যে স্বাধিকারের বাণী প্রচণ্ড রূপ পেয়েছে; অথচ পুরো কবিতার সঙ্গে জুড়ে দিলে এগুলো ম্লান হয়ে যায়। কারণ, কবিতাগুলোয় কবির লক্ষ্যবিন্দু

কোনোভাবেই স্বাধীকারের বাণী উচ্চারণ নয় – সময়ের বাস্তবতায় এর কিছু প্রভাব পড়েছে মাত্র। তবে স্বদেশের স্নিগ্ধ-মনোরম ছবি এঁকেছেন পরম যত্নে :

জোনাক পোকা দীপ জ্বালাবে
চাঁদ যদি নেই জেগে
বকুল-ঝরা মাটির ফুলে
তোমায় দেব ঢেকে।

['সাত নরী হার-৫' : *সাত নরী হার*]

নিছক প্রেমের কবিতা হলেও এর মধ্যে লোকজ উপাদান এবং রূপকথার আবহ যুক্ত হয়ে একধরনের ভাবালুতা তৈরি করেছে। নিপীড়ক গোষ্ঠী কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা বলার সময়ও সেই ভাবালুতা দূর করা সম্ভব হয়নি :

আরো দ্যাখো বাহার দ্যাখো
সাজে সাজে বর্গী সাজে
... ...
যাদুকরের যাদু দ্যাখো
ভিটা জমির ভাঙন দ্যাখো।

['মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়-২' : *সাত নরী হার*]

সাত নরী হার কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোর ছবি পরস্পরবিচ্ছিন্ন – যদিও কখনো কাহিনি এসেছে, কিন্তু সেই টুকরো ছবিগুলোকে জোড়া দেওয়া হয়নি। এদিক থেকে 'মাগো, ওরা বলে' কবিতাটি ব্যতিক্রম – অবাধ এবং স্পষ্ট। এ কবিতার শেষে পুনশ্চের মতো জুড়ে দেওয়া পঙ্‌ক্তিদ্বয় এরকম :

এখন
মা'র চোখে শিশির ভোর
স্নেহের রোদে ভিটে ভ'রেছে।

['মাগো, ওরা বলে' : *সাত নরী হার*]

এই ছোট্ট স্তবকটি (Envoy) কবিতার গল্পকে থামিয়ে দিলেও কবিতার ভাবকে সুদূরপ্রসারী করেছে : অযুত সম্ভাবনা নিয়ে পঙ্‌ক্তিদ্বয় স্থিত হয়েছে।

৩.২

বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৭০-এ প্রকাশিত *কখনো রং কখনো সুর* কবিতাগ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে কবির *সাত নরী হার* থেকে বেছে নেওয়া কয়েকটি কবিতার সংকলন।

এই গ্রন্থটি কবি নিজেও দেখেছেন কিনা সন্দেহ। এটি হিসেবের বাইরে রাখলে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের *কমলের চোখ* (১৯৭৪)। প্রায় দুই দশক পরে কবিতার প্রিয় ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করলেন। মাঝখানে বেশ কয়েক বছর কিছুটা প্রাত্যহিক প্রয়োজনের জড়তায়, কিছুটা অভিমানে কবিতার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ষাটের দশক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়পর্ব হিসেবে চিহ্নিত। জাতীয় জাগরণ, সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের বীজ মূলত এই পর্বেই রোপিত হয়ে যায়, যার পরিণাম হিসেবে ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী সংগামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ অর্জন করে তার বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা লাভের জন্য পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে বারংবার লিপ্ত হতে হয়েছিল নানা ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সংগ্রাম-সংঘাতে। দেশ-বিভাগের পর থেকেই পাকিস্তানের প্রশাসন-কাঠামোর স্বৈরাচারী ও সমরমুখী একটি প্রবণতা ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে; যার চূড়ান্ত পরিণতি ষাটের দশকের প্রথমার্ধ। (মাওলা, ১৪০৪ : ২০১)

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ এই গুরুত্বপূর্ণ সময়পর্বে কবিতা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলেও প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকে তাঁর উত্তরণ ঘটেছে – অন্তত অন্তর্গত ভাবের গভীরতায়। ‘কবিতা’ সাহিত্যের অন্য সব আঙ্গিক থেকে পৃথক হয়ে ওঠে মূলত দুটি কারণে : প্রথমত, এর চলার ছন্দ; দ্বিতীয়ত, ভাবের গভীরতা ও বিস্তৃতি। *কমলের চোখ* কবিতাগ্রন্থে কবির সহজাত ছন্দরীতির পরিবর্তন ঘটেনি – গীতল ছড়ার ছন্দ বজায় থেকেছে। কিন্তু কবির ভাব আরও বিস্তৃত ও গভীরতর হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ প্রায় দুই দশক আত্মমগ্নতায় স্থিত থাকা এর একটি কারণ বটে, তবে বয়সজনিত অভিজ্ঞতাও এর পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল। প্রাজ্ঞ কবি উচ্চারণ করেন :

কতিপয় যুবা ঈশ্বরের মত
মহৎ হবে না।
তারা স্বেচ্ছায় ভালবেসে বাঁচে
শেফালীর ফুলে। অথবা যুদ্ধে
মরে যায় আহা।
কতিপয় যুবা ঈশ্বর হবে না।

[‘কতিপয় যুবা’ : *কমলের চোখ*]

এই বিষণ্ন পঙ্ক্তিগুলোর মধ্যে হতাশা নেই; আছে জীবনের উদ্বোধন। ‘কতিপয় যুবা’ কবিতাটি সংক্ষিপ্ত – তাঁর অধিকাংশ কবিতারই পরিসর সীমিত, তবে এই কবিতার শুরুটা নাটকীয় : ‘এই মাত্র কিছু লোক চ’লে গেল/ শব কাঁধে নিয়ে/ নিঃশব্দে নয়

সরব উচ্চারণে।' তাদের উচ্চারিত শব্দমালা ছিল – 'প্রভু হে সকলি তোমার ইচ্ছা/ তুমিই করুণা।' কবি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেন, ঈশ্বর মহান হয়ে উঠেছেন; কারণ ঘাতক তিনি!

কমলের চোখ কবিতাগ্রন্থে স্বাধিকারের শব্দাবলি আরও দীপ্ত, কঠিন হয়ে উঠেছে। 'ক্রোধ এবার' কবিতায় 'তৃষ্ণাতে বুক ফাটলে ক্ষতি নাই/ ক্রোধ এবার তোমার ভাষা হবে', কিংবা 'প্রচণ্ড ঘৃণা মধ্যাহ্নের সূর্য/ সংহত ক্ষোভ উদ্যত ফণা কেউটে' – এগুলো প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। নিষ্পেষিত জনতা এখন প্রত্যাঘাতের জন্য প্রস্তুত :

পালাবে কোথায়? সব পথ আজ বন্ধ,
বহ্ন্যুৎসবে পল্লী নগরী মত্ত।
এবার তোমার বংশ নিধন যজ্ঞ
ক্ষোভে সংহত ঘৃণায় সঙ্ঘবদ্ধ।

['ক্রোধ এবার-২' : *কমলের চোখ*]

সংগ্রামী চরিত্রের প্রতীক হয়ে উঠেছে কমল – কমল সিদ্দিকী – যার একটা চোখ বুলেট 'ছিঁড়ে নিয়ে গেছে', হৃদপিণ্ড যার/ কুকুর শিয়াল খেয়ে/ আজ পলাতক' ['কমলের চোখ']। একদিকে প্রকৃতি, অন্যদিকে শোষকের নির্মমতা-অনাচারের বিরুদ্ধে সর্বসাধারণ একতাবদ্ধ ও দৃঢ়সংকল্প হয়ে উঠেছে। কবি তাই উচ্চারণ করেন : 'বটের শিকড়/ আমরা যে/ ওপড়াবে তার/ সাধ্য কি?' ['ক্রোধ এবার-৪']।

প্রাকৃত বাঙালির রক্তস্রাবী সংগ্রাম সংগঠনের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যে কবি উচ্চকণ্ঠ হলেও *কমলের চোখ*-এ তাঁর বিদগ্ধ আত্মমগ্নতা লক্ষ করা যায় – যেখানে শৈশব-কৈশোর, অথবা চাপিলা-কাজলী মাছ কিংবা কোনো উজ্জ্বল বিলীয়মান পাখির উপস্থিতি। 'অথবা শীতল দিঘি' কবিতায় স্বদেশের যে ছবি ফুটে উঠেছে তা বাস্তব হলেও এর বর্ণনাভঙ্গি স্বপ্নময়। নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত কবি কৈশোরে হারানো মা-কে শালিক পাখির রূপকল্পে ফিরে পান :

মা কি শালিক পাখি?
খয়েরী শাড়িতে তাঁর
হলুদের ছোপ

['মা তুমি-২' : *কমলের চোখ*]

মায়ের প্রতি এই গভীর ভালবাসা সীমিত অবয়ব ছেড়ে জাতীয় চেতনায় সন্নিবিষ্ট হয়। কবি বেদনা ও গৌরবের সঙ্গে লক্ষ করেন : 'ভালবাসা দিলে মা মরে যায়/ যুদ্ধ আসে, ভালবেসে/ মায়ের ছেলেরা চ'লে যায়।' ['মা তুমি-৩']

৩.৩

আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি (১৯৮১) কাব্যগ্রন্থটিতে সত্তর-দশকীয় কবিতার সাধারণ প্রবণতা খুব সামান্যই অনুভূত হয়। সময়ের অভিঘাতে কবি ক্লিষ্ট, স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় আশাহত; কিন্তু এ সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর – তাতে আশা ও আকাঙ্ক্ষা তীব্রভাবে বিরাজমান। প্রায় দুই দশক কবিতা থেকে দূরে থাকার সময়ে যেসব অনুভূতি তাঁকে তাড়িত করেছে, অথচ লিখতে পারেননি, *আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি* কবিতাগ্রন্থে এর নব-উচ্চারণ ঘটেছে। এখানে ফিরে এসেছে মুক্তিযুদ্ধ-পূর্বকালীন উত্তাল আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরব ও বেদনা এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী অবক্ষয়িত মূল্যবোধ। কবির সরল ছড়ার ছন্দের কারণে আপাতদৃষ্টিতে কবিতাগুলোকে সহজবোধ্য মনে হলেও এগুলোর অন্তঃপ্রবাহিত ভাবটি বেদনা, গৌরব ও স্বপ্নকে ধারণ করে।

বিরুদ্ধ সময় ও সমাজে অবস্থান করলেও কবি এখানে প্রতিবাদে সোচ্চার। প্রাকৃতিক ঝড়ের প্রতীকে তিনি বিনষ্ট সময়কে তুলে ধরেন :

> সব কিছু প্রতিকূল।
> আবহাওয়া,
> দুর্যোগে বাতি নিভে গেছে।
> হাওয়ার দাপটে
> প্রাচীন বাড়িটা কাঁপে। ল্যাম্পপোস্ট
> দুম্‌ড়ে প'ড়েছে। আশা পরাজিত।
> হঠাৎ জানালা থেকে কাচ ভেঙ্গে পড়ে ঝন্‌ ঝন্‌,
> বজ্রের শব্দ ডিঙ্গিয়ে
> তীক্ষ্ণ চীৎকার জ্বলে ওঠে,
> আমি মান্‌বো না।

['আমি মান্‌বো না' : *আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি*]

সংগ্রামী চেতনা আবু জাফর ওবায়দুল্লাহকে বিশিষ্ট করেনি। কারণ স্বাধীনতার পূর্বকাল থেকেই এই প্রবণতা বাংলা কবিতাকে বেগবান করেছে। কিন্তু আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর ভাষার মধ্যে প্রদীপ্ত আশা জাজ্বল্যমান। তীব্র প্রতিরোধের কথা শোনাতে গিয়েও জটিল উপমা-উৎপ্রেক্ষা (Conceit)-র আশ্রয় নেননি। সময়ের বদলে শাসক বদলায়, কিন্তু শোষণ নবতর মাত্রায় অভিযোজিত হয়। শোষককে কবি প্রতিস্থাপিত করেন প্রভুর স্বেচ্ছাচারী প্রতীকে :

প্রভু যায় প্রভু আসে।
সকলেই আমাদের
ধোঁয়া ওঠা ঘরের দেয়ালে
চাঁদ আঁকে।

['প্রভু যায় প্রভু আসে' : *আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি*]

যে আশ্বাস ও স্বপ্নে বিভোর হয় সাধারণ মানুষ, তা ভেঙে যেতে বেশি দিন লাগে না। একটির পর একটি খোলস ছাড়তে থাকে শোষক – বারংবার বদল ঘটতে থাকে শাসকের, কিন্তু 'আমরা জনতা/ উলঙ্গ ক্ষুধার্ত পূতিগন্ধময়'ই রয়ে যাই। সুতরাং ক্ষুব্ধ কবি উচ্চারণ করেন : 'মাঝে মাঝে দাঁত দিয়ে/ প্রভুদের মুখোশটা ছিঁড়ি।' ['প্রভু যায় প্রভু আসে']

কাব্যিক শব্দ-সম্ভার (Poetic Diction)-এ সমকালীন কবিদের মধ্যে ঐক্য থাকলেও আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ এ-দিক থেকে স্বতন্ত্র। কিছু মোটিফ (Motif)-কে তিনি পুনঃপুনঃ ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেকে স্বকীয় করে তুলেছেন। এগুলোর মধ্যে আছে – মা, কৃষ্ণচূড়া, চাঁদ ইত্যাদি। শালিক পাখির বেশে, পূর্ববৎ, এই কাব্যগ্রন্থেও মা ফিরে এসেছে : 'বিকেল বেলা শালিক পাখি/ মায়ের কথা মনে পড়ে' ['আত্মচরিত']। কৃষ্ণচূড়া ভাষা-আন্দোলনের প্রতীক হিসেবেই বিরাজমান : 'কৃষ্ণচূড়া কাট্‌লো যখন/ কাঁদতে গিয়ে ঢোক গিলেছি/ কারণ আমার ভালোবাসা' ['কারণ আমার ভালবাসা']। চাঁদ তাঁর কবিতায় বরাবরই মায়াবী আলো বিলিয়ে গেছে।

স্বাধিকারের সমষ্টিগত চেতনা *আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি* কাব্যগ্রন্থেই অধিকতর প্রস্ফুটিত হয়েছে। কবির রাজনীতি সচেতনতারও পরিচয় পাওয়া যায় এ কাব্যে। কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'আত্মচরিত'-এ স্বাধীনতা-পূর্বকালীন, যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর সময়ের তিনটি চিত্র লক্ষ করা যাক :

ক. দাদা তখন পালিয়ে থাকে
মত্ত হাতী রাজার রোষে

খ. মা'য়ের ছেলে যুদ্ধে গেল
নিজের দেশে পরবাসী

গ. যুদ্ধ এখন শেষ হ'য়েছে
মা'য়ের সবার ছোট ছেলে
ফুলের ক্ষত বুকে নিয়ে
লাল গোলাপের সূর্য খোঁজে।

প্রথম দুটিতে স্বাধীনতার প্রবল স্পৃহা ও আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে; তাই স্বেচ্ছায় কষ্টকে বরণ করে নিয়েছে ভাই – মায়ের ছেলেরা। কিন্তু শেষেরটিতে আশাহতের বেদনা। 'আত্মচরিত' কবিতার পুরোটা জুড়ে কবির ব্যক্তিজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে; কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক পালাবদলের ইতিহাস সেখানে অনুপস্থিত নয়। পারিবারিকভাবে যে রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠেছেন, ছাত্রজীবনে এবং পেশাগত জীবনেও তাঁর যে রাজনীতি-সংশ্লিষ্টতা, তাতে কবিসত্তার বিকাশ সহজসাধ্য ছিল না। অথচ এই 'পলিটিক্যাল ইনটেঙ্গে'র সঙ্গে কবির সংবেদনশীল মন যুক্ত হয়ে তাঁর কবিতাকে অপরূপ করে তুলেছে। 'অস্ত্র'কে দমনের – এমন কি প্রতিরোধ বা প্রতিশোধের উপকরণ হিসেবে কখনোই তিনি মনে করেননি :

বন্দুক নামিয়ে ফেল
হাঁসকে মেরো না।
মেঘ নিঃসঙ্গ হবে
শিশু নিঃসঙ্গ হবে
দেশে আকাল হবে
মা দুঃখ পাবে।

['মা দুঃখ পাবে' : *আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি*]

ওবায়দুল্লাহর কবিতায় পশ্চাদঝলক (Flashback) লক্ষ করা যায়। তিনি প্রায়শই অতীতে ফিরে যান – পূর্বের ঘটে যাওয়া ঘটনা বা দৃশ্যকে বর্তমানের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে দেন। দীর্ঘদিন আগে হারানো মাকে এবার কন্যার মধ্য দিয়ে ফিরে পান : 'মা কখনো যায় না চ'লে/ হারিয়ে যেতে পারে/ আমার মা'মন আসলো ফিরে/ তিরিশ বছর পরে।' ['মা কখনো যায় না চ'লে']। নিতান্তই ব্যক্তিক অনুভূতি; আবেগ স্থিত না হওয়ায় তা উৎকৃষ্ট কবিতা হয়ে উঠতে পারেনি। এরচে' বরং অতীতে ফিরে গেলে উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যাবে :

শৈশব অস্পষ্ট।
কৈশোর আব্ছায়া নদী
মস্জিদ ছুঁই ছুঁই কীর্তন খোলা
ছুটিতে দেশের বাড়ি
হোগ্লার পাটি,
প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র
তার তীরে ছোট্ট শহর,
সেইখানে মা সমাহিত।

['বাঁশি শুনি পাখিদের গান' : *আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি*]

কবি পুরোপুরি নাগরিক হলেও তাঁর কবিতায় গ্রামের ছবিগুলোই দৃষ্টিগ্রাহ্য মোহনীয় রূপ লাভ করেছে। পচানো পাটের গোছা, সজিনার ডাঁটা, ধান্ কুড়ানিয়া পাখি, লাউয়ের মাচান, নিকানো উঠানে ধান, ডুরে শাড়ি, ঘাসের ফড়িং – এগুলো তাঁর কল্পনার ছবি নয় – স্বদেশের প্রত্যক্ষ উপকরণ। অতীত সমৃদ্ধির অনেকাংশই লুপ্ত হয়েছে – ব্রিটিশ শাসনামলে, পাকিস্তান আমলে, এমনকি যুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলোতেও! যুদ্ধের সময় যারা ছিল পাকিস্তানীদের পক্ষাবলম্বনকারী, লুক্কায়িত, বিশ্বাসভঙ্গকারী, যুদ্ধ-শেষে তারাই স্বার্থসিদ্ধির জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে :

যুদ্ধে যাহারা গর্তের অধিবাসী
যুদ্ধের শেষে তাহারাই সোচ্চার
অতি নিরাপদ দেয়ালে ইস্তাহার
শান্তি কপোত এবং ভালবাসার।

['অতি নিরাপদ দেয়ালে' : *আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি*]

এদেরকে যারাই ভালবাসুক না কেন, কবি তাদের জন্য ঘৃণাই ঢেলে যাবেন। স্বদেশ রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত যখন হয়েছে, তখন কবিতায় আর তাকে লুকাতে যাবেন না তিনি। এখন তাই তাঁর কাছে 'কবিতা' ভিন্ন সংজ্ঞার্থ বহন করে : 'কবিতা কদর্য ক্ষুধা,/ শূয়োর ছানার মত একপাল দুর্গন্ধ শিশু/ মৃত্যুর গলিত শব অসনাক্ত লাশ্' ['কবিতা রক্তাক্ত ক্ষত']। কিন্তু কবির গন্তব্য কোনোভাবেই অন্ধকারাচ্ছন্ন নিরাশা নয়। তিনি মনে করেন – 'কবিতা শেফালী ফোটাবে ভোরে'। কবিতাকে অযুত সম্ভাবনার ইঙ্গিতবহ বলে বিশ্বাস করেন তিনি :

এখানে শব্দ ক্ষুব্ধ কৃষ্ণচূড়া
বুলেটে বিদ্ধ উষ্ণ রক্তে বোনা
জননী কান্না আমার তোমার ঘৃণা
মিছিলে আগুন এবং সম্ভাবনা

['এখানে শব্দ ক্ষুব্ধ কৃষ্ণচূড়া' : *আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি*]

৩.৪

সহিষ্ণু প্রতীক্ষা (১৯৮২) প্রকাশিত হয় তাঁর পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থের এক বছর সময়ের ব্যবধানে। প্রকাশকালের দিকটি বিবেচনা করলে এ-কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোর প্রবণতা *আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি*র অনুরূপ হওয়ারই কথা। কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার হল কবিতার প্রকরণে খানিক বদল ঘটেছে : ছড়ার ছন্দ প্রায় অনুপস্থিত, কবিতার পরিসর দীর্ঘতর এবং বিষয়কে ছাপিয়ে ব্যাপ্তিলাভ করেছে ভাব। কবি সমৃদ্ধ অতীতের

সঙ্গে বর্তমানকে সংযুক্ত করতে সচেষ্ট – বিনষ্ট সময়ের অভিঘাতে হতাশা আছে, ক্লান্তি আছে, আর হতাশা-ক্লান্তিকে ম্রিয়মাণ করে দিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে স্বপ্ন ও প্রত্যাশা।

'একজন বৃদ্ধ সাপ' কবিতায় কবি প্রভুর প্রতিবিম্বে শাসককে অবলোকন করেছেন। একজন স্বেচ্ছাচারী শাসকের ক্ষমতা থাকে উৎসবের বাদ্য স্তব্ধ করার, উলঙ্গ শিশুকে কাফন পরানোর, নৃত্যরত পথিকের অঙ্গহানি করার কিংবা অসংযত গায়কের জিহ্বা ছেদনের। এখন কবির প্রশ্ন :

কিন্তু সমুদ্রের উচ্চারণ ঝড়ের কণ্ঠস্বর এবং
পাখিদের নৃত্য আপনি কেমন করে বন্ধ করবেন?

['একজন বৃদ্ধ সাপ' : *সহিষ্ণু প্রতীক্ষা*]

বৃদ্ধ সাপ যেমন তার প্রাচীন খোলস ছাড়তে পারে না, তেমনি শোষক পারে না চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের রূপান্তর ঘটাতে। গৃহপালিত পশুর কাছে অরণ্যের হরিণকে যেমন মনে হয় উদ্ভট এবং বাউণ্ডুলে, তেমনি শোষকের কাছে স্বাধীনতার তাৎপর্য অর্থহীন মনে হয়। কবির চোখে প্রভু তথা শাসক হয়ে ওঠে গৃহপালিত পশু, বৃদ্ধ সাপ। চারপাশে কবি দেখতে পান 'কিছু কিছু দৈত্যদানো' – এরা আমাদের হাতের মধ্যে থাবা রেখে চোখ বুঁজে বসে থাকে; কিন্তু যখন তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে, 'তখন ওরা জেগে উঠবে।' ['কিছু কিছু দৈত্যদানো']

অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে দেশের যুব-সমাজকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। 'গোক্ষুরের মত ঘৃণায়/ শ্বাপদের মত জিঘাংসায়/ বাজপাখির মত দুর্ধর্ষ ক্রোধে' গুটিকয় মানুষরূপী দানবকে ধ্বংস করতে হবে। কবি স্থির, জড়বৎ যুবকদের প্রতিবাদহীন নীরবতাকে মেনে নিতে পারেন না :

জোয়ান পুরুষেরা কাঁদে কেন?
কান্না পুড়িয়ে ফেলে হিংস্র থাবায়
ছিঁড়তে পারে না কেন রাজার হৃদয়?
ভাঁটার মতন চোখে আগুন জ্বলে না কেন
ঘৃণার আগুন।

['জোয়ান পুরুষেরা কাঁদে কেন?' : *সহিষ্ণু প্রতীক্ষা*]

'বৃক্ষ, বৃক্ষ করো' কবিতায় কবি অন্য কথা বলেছেন : তিনি বৃক্ষের মতো সহিষ্ণু, ধৈর্যশীল হতে চান। অস্তিত্বের বিপন্নতা অনুভব করে কবি বৃক্ষের মধ্যে আশ্রয় খোঁজেন। আমরা যখন আমাদের নিজেদেরকে সপ্রাণ কিংবা নিষ্প্রাণ কিছুর সঙ্গে

একাত্ম করি, আমাদেরকে সম্প্রসারিত করে তার মধ্যে প্রবিষ্ট হই, তখন তাকে বলা হয় স্বআরোপতা (Empathy)। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কবিতায় প্রকৃতি এসেছে ভালবাসার পরিজন হয়ে, কিন্তু তাঁর কবিতার কেন্দ্রে রয়েছে মানুষ। এই মানুষ কখনও বা প্রকৃতির মধ্যেই প্রবিষ্ট :

শুনেছি মা'য়ের চোখ
বেতের ফলের মত বিষণ্ন ছিল,

কিংবা

আমার মেয়ে বাবুই পাখির মত গান করে
গাংচিলের মত নেচে বেড়ায়

['আমার ঠিক মনে পড়ে না' : *সহিষ্ণু প্রতীক্ষা*]

প্রায় দুশ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটলে আমরা পাকিস্তান পেয়েছি; এরপর প্রায় পঁচিশ বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশ। এর আগে একটির পর একটি আমলের পরিবর্তন ঘটেছে – শাসক তার নিজের স্বার্থ নিয়েই বরাবর কাজ করে গেছে, আমাদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হয়নি। ইতিহাস-সচেতন কবি আমাদের ব্যর্থতার বৃহত্তর কারণ উদ্‌ঘাটন করে বলেন :

কারণ জুতো বদলানোর মত
আমরা দেশ পরিবর্তন করেছি
আমরা শ্রেণি-যুদ্ধের অলিন্দে বিচরণ করেছি
এবং যখন অন্যায় ছিল কিন্তু বিদ্রোহ ছিল না
তখন নৈরাশ্যে নিঃশব্দ হয়ে গেছি।

['আমার উত্তম পুরুষকে' : *সহিষ্ণু প্রতীক্ষা*]

'গাত্রে তাম্রলিপি' কবিতায় কবি মৃত্তিকা-প্রোথিত শিকড়ের সন্ধানে ফিরেছেন। সাফল্যকে সুনিশ্চিত করে তুলতে অতীতকে অভিযোজিত মাত্রায় গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই :

কণ্ঠে কবিতা তার প্রপিতামহের
অঙ্গের সৌকর্য শ্রাবণের ধারা
শস্যের নক্ষত্রে খচিত আকাশ
গাত্রে তাম্রলিপি নীল স্বাধীনতা।

['গাত্রে তাম্রলিপি' : *সহিষ্ণু প্রতীক্ষা*]

৩.৫

সহিষ্ণু প্রতীক্ষার পরের বছরই বের হলো *বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা* (১৯৮৩)। একেবারে অভূতপূর্ব এর কণ্ঠস্বর, অভিনব এর পঙ্‌ক্তিমালা। কেবল কবিভক্ত পাঠকদেরকে নয়, সমালোচকদেরকেও চমকে দিয়েছে এই গ্রন্থের কবিতা দুটি। কবির পূর্বের কোনো কবিতার সঙ্গেই একে মেলানো যায় না। তবে খুব সূক্ষ্মভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, *সহিষ্ণু প্রতীক্ষার* দু-একটি কবিতার মধ্যে এই নব প্রকরণের সম্ভাবনা, ইঙ্গিত লুকিয়ে ছিল।

'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' কবিতায় কবি মন্ত্র (Incantation) উচ্চারণের সম্মোহনী ভঙ্গিতে ইতিহাসে-ঐতিহ্যের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। সভ্যতার পরিবর্তনে মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসকে বর্তমানের সঙ্গে সূত্রবদ্ধ করেন তিনি। কবি তাঁর পূর্বপুরুষ নিপীড়িত ক্রীতদাসের কথা বলেন – যার সাহস, সংগ্রাম ও কর্মপ্রচেষ্টায় পৃথিবীর বদল ঘটেছে। ক্রীতদাস হওয়ার জন্য সে নিজে দায়ী নয় – 'সভ্য' ইউরোপীয়ানদের দ্বারা পুরোপুরি প্রতারিত; আর এই হীন পরিচয়কে মুছে ফেলতে কী দুঃসাহসিকতারই না পরিচয় দিয়েছে! আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কবিতায় এই সত্য শব্দকে তুলে ধরেছেন :

জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা
কর্ষিত জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে ঝড়ের আর্তনাদ শুনবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।
যে কবিতা শুনতে জানে না
সে আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে।

['আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' : *বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা*]

'কবিতা' মানে সৃষ্টি। কবিতার ক্ষমতা অপরিমেয়। কবিতা কখনো হয়ে ওঠে শোষকের প্রতিপক্ষ; আবার শোষকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে কবিতা আপন বেগে প্রবাহিত হয়ে চলে। কবি দ্বিধান্বিত – তিনি তাঁর পূর্বপুরষের মতো কবিতার কথা বলতে পারবেন কি-না, পারবেন কি-না স্বাধীনতার কথা বলতে।

কৃষিসভ্যতা থেকে যূথবদ্ধতার মধ্য দিয়ে সভ্যজগতে প্রাগ্রসর মানুষ কখনোই নিজের অধিকারকে পুরোপুরি ফিরে পায়নি – স্বাধীনতা সাধারণের কাছে স্বপ্নই থেকে যায়। নগরসভ্যতার গোড়াপত্তনে মানুষের ক্ষুধা, জননীর শোকসন্তাপ আর আদিগন্ত

বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটে না। 'স্বাধীনতা'র নামে আমরা একটির পর একটি মোড়ক বদলানো আয়োজন দেখি – অনেক স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষায় আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হই; কিন্তু আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে না। স্বেচ্ছাচারী শোষকের খোলস বদলাতেই থাকে; কবি তবু প্রত্যাশাচ্যুত হন না :

আমি বিষসর্প প্রভুদের
চির প্রয়াণের কথা বলছি
দ্বন্দ্ব এবং বিরোধের
পরিসমাপ্তির কথা বলছি
সুতীব্র ঘৃণার
চূড়ান্ত অবসানের কথা বলছি।

['আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' : *বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্যে প্রার্থনা*]

গতিশীল মুক্তছন্দ (Free Verse)-এ লেখা এই কবিতাটি কবির উপলব্ধি-আবেগ-আকাঙ্ক্ষা ও প্রজ্ঞার প্রাখর্য তুলে ধরেছে। প্রায় অনুরূপ আরেকটি কবিতা 'বৃষ্টি এবং সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা'। কবি নিজের সীমাবদ্ধতার কারণে যা কিছু করতে অপারগ ছিলেন, তার সফলতার জন্য একজন সাহসী পুরুষকে কামনা করেন। নির্ভীক একজন পুরুষের পরিচয় 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' কবিতায় আমরা পেয়েছি – কিন্তু অতীতের সেই পুরুষের ধারাবাহিকতায় একজন সাহসী উত্তর-পুরুষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যার আগমনে বৃক্ষহীন প্রান্তর আবার শ্যামল হয়ে উঠবে, বিশীর্ণ নদী ভরে উঠবে, রুক্ষ মৃত্তিকা প্রাণ ফিরে পাবে।

শস্যের বীজ, বৃক্ষের বিশালতা আর কবিতার শব্দাবলি কবির কাছে সমার্থক হয়ে ওঠে। 'বৃষ্টি এবং সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা' কবিতায় আবেগের প্রাবল্য থাকলেও গতানুগতিক বিষয়বস্তু বা বাঁধাধরা ছন্দ প্রকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ইমেজিসম (Imagism)-কে গ্রহণ করে কবিতা তার নিজস্ব বিষয়বস্তু এবং সুর নির্বাচন করেছে স্বাধীনভাবে; উপস্থিত করেছে এমন চিত্রকল্প যা সুস্পষ্ট, ঋজু ও সুসংহত। কবি সহিষ্ণু প্রতীক্ষায় প্রহর গুনেছেন :

যে সাহসী সে যুদ্ধে গেছে
যে সন্ত্রস্ত সে বর্ণের অধিকার থেকে বঞ্চিত
এবং আমি নিঃসঙ্গ ধূ ধূ,
শুক্‌নো পাতা ছাড়া কোন ছায়া নেই
শামুকের ধার ছাড়া কোন সঙ্গী নেই –
আমি তোমার জন্য

অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় আছি।

['বৃষ্টি এবং সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা' : *বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা*]

কবির এই প্রতীক্ষার অবসান ঘটবে – প্রকৃতি ও প্রাণ আবার সজীব হয়ে উঠবে – এ ব্যাপারে কবির দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে।

৩.৬

আমার সকল কথা (১৯৯৩) কাব্যগ্রন্থে কবি যুদ্ধ করে চলেছেন সমসময়ের সঙ্গে। ব্যক্তিচেতনা এখানে প্রবলতর হয়ে উঠেছে। স্বাধিকারের সমষ্টিগত চেতনার বৃহৎ বৃত্তটি এখানে ক্ষুদ্রতর; কিন্তু সেই বৃত্তের কেন্দ্রের সংকট উজ্জ্বলতর হয়ে অন্য সবার সংকটকেও প্রকাশ করে দিয়েছে। সুতরাং এখানে স্বাধিকার মানে নিজের তথা ব্যক্তির অধিকার। এ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোয় স্বদেশ হয়ে উঠেছে ব্যাধিগ্রস্ত, আক্রান্ত। কবি যখনই কণ্টকিত সময়ের মুখোমুখি হয়েছেন, কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকৃতিতে আশ্রয় নিয়েছেন।

'আমার সময়' কবিতায় কবি তাঁর সময়কে অস্থির, অনিরাপদ বলে অভিহিত করেছেন। সমাজ বদলে যে সুগভীর প্রত্যাশা ও আস্থা তাঁর মধ্যে ছিল, এ সময়পর্বে এসে সেই প্রত্যাশা ও আস্থা ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকে। মাতৃনাভি থেকে বিচ্যুত হওয়াকে তিনি শিকড়-বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। একধরনের নির্লিপ্ততা, প্রৌঢ়ত্ব তাঁর এ-সময়ের কবিতাকে গ্রাস করেছে :

আমি আমার স্ত্রী পুত্র কন্যার সঙ্গে
কথা বলি
মাঝে মধ্যে ভাই বোনেরা আসে
যতটুকু দরকার
ঠিক ততটুকু
এবং ইদানীং
আমি আমার বিপদ আপদের বন্ধুদের
অনায়াসে এড়িয়ে চলি

['আমার সময়' : *আমার সকল কথা*]

সমাজ ও সংকট থেকে স্বেচ্ছায় আত্মগোপন করছেন কবি। কারণ তিনি চোখের সামনে যা দেখছেন, তাকে মেনে নিতে পারছেন না। তাঁর সময়ে যুবকেরা আত্মগোপন করে বেড়াত, অথবা ধরা পড়ত; আর যে ধরা পড়ত সে বেঁচে থাকবে

কি-না তার নিশ্চয়তা ছিল না। কিন্তু জেলখানায় রক্তপাত আর রাজপথের রক্তের মধ্যে বিস্তর ফারাক – রঙে নয়, উচ্চারণের ভঙ্গিতে : জেলখানায় মৃত্যু মানে বাকস্বাধীনতার হরণ। কবি তাঁর সময়ের ভয়াবহতা তুলে ধরেছেন এভাবে :

আমার সময়ে
মায়ের পেট ছাড়া
কোথায়ো কোন
নিরাপত্তা ছিল না।

['আমার সময়' : *আমার সকল কথা*]

আমার সকল কথা কাব্যগ্রন্থের নামকবিতায় কবি যদিও বলেন, 'আমার সকল কথা/ অকপটে ব'লে যাব'; কিন্তু কেবল এটুকুই আমাদের জানান :

আমার সময় ছিল খল প্রকৃতির
আমার সময় ছিল
শিকারীর শ্রেষ্ঠ সময়।

['আমার সকল কথা' : *আমার সকল কথা*]

সমসময়ের নিষ্ঠুরতায় কবি নিমজ্জিত হন অতীতের সুষমায়। সমৃদ্ধি আর শ্যামলতার কথা বলতে গিয়ে কবি কখনো বা আক্রান্ত হন নস্টালজিয়ায়। মা পুনরায় ফিরে আসে শলিক পাখির রূপকল্পে, আশ্রয় নেন প্রকৃতির সান্নিধ্যে। কিন্তু কল্পনার কাচগুলো ভেঙে যেতে দেরি হয় না। যারা বদল ঘটাবে সমাজের, বিপথগামী স্রোতকে ফিরিয়ে আনবে গতিপথে, তাদের আর দেখা পাওয়া যায় না। এখন –

কয়েকটা কাক ছাড়া
কিছুই অবশিষ্ট নেই
না পাখি না বৃক্ষ :
পরিচিত পথঘাট বড় বেশি নির্জন।

['শেষ আর্তি-৩' : *আমার সকল কথা*]

৩.৭

খাচার ভিতর অচিন পাখি কাব্যগন্থের নামকরণের মধ্যে বাউল-দর্শনের প্রভাব বিদ্যমান থাকলেও এ গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতার উদ্দিষ্ট ভিন্ন। বিশ শতকের অন্তিমে দাঁড়ানো পরিণত কবির ভাবনার ক্ষেত্রটিও এখানে পরিব্যাপ্তি লাভ করেনি। মধ্যযুগীয় ভাবালুতায় (Sentimentalism) আক্রান্ত হয়ে কবি আবার মায়ের কাছে ফিরে গেছেন,

নিজের নিঃসঙ্গতা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন : 'আমি যে ভীষণ একা/ তুমি ছাড়া, আমার জননী ।' ['শিশির রোদ']

যে সহজ মানুষের খোঁজে বাউলেরা ঘুরে ফেরেন, সাকারের নিরেট বন্ধন ভেঙে নিরাকারের সন্ধানে মগ্ন হন, কবিও তাতে আত্মলীন হতে চান :

এই যে তোমার চারিদিকে
মাটির টিয়া পাখি
মরা কাঠের হরিয়াল
দেয়ালে পালতোলা মেঘ
সাদা-নীল-ধূসর-হল্‌দে,
তুমি তো
আকারের মধ্যে ডুবে আছো ।

['খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' : *খাঁচার ভিতর অচিন পাখি*]

ওবায়দুল্লাহর শেষের দিককার কিছু কবিতায় স্বপ্ন ও আশাভঙ্গের বেদনা ধ্বনিত হলেও সামগ্রিক বিবেচনায় তাঁর কাব্যভাষার পরিণতি হতাশার নিমজ্জনে শেষ হয়ে যায়নি। তিনি পিতার দীপ্ত মূর্তির মধ্যে বিশালতা ও দৃঢ়তাকে অভিব্যঞ্জিত করেন :

শালপ্রাংশু বৃক্ষের গুড়ির মত
পোড়ামাটির চাদর গায়ে জড়িয়ে
তিনি বাইরে এলেন
জোনাকি এবং শিশিরের অন্তর্বর্তী উঠানে ।

['পিতার ছবি' : *খাঁচার ভিতর অচিন পাখি*]

সময়ের অভিঘাতে মানুষের যে পরাজয় ঘটে না – বেঁচে থাকে মানবিকতা ও সূক্ষ্ম অনুভূতি, তার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে 'নিঃশব্দ মর্মরে' কবিতায়। একজন সংগ্রামীকে শোষক বন্দী করে রাখতে পারে : বন্দী সেই মানুষটির মনে মুক্ত জীবন হাতছানি দেয় – 'উঠানে ভরা চাপিলার মত রোদ/ বাতাসে পাকা ধানের বাদামী আঘ্রাণ/ কুয়োর জলে পৌষের হিম/ জেলখানার বাসি রুটিতে ভাপা পিঠার ওম্ ।' মুক্তি পাবার পর ক্ষুধার্ত সেই লোকটি পথের ধারের খাবার দোকানে উনুনে-ঝল্‌সানো শীতের পাখি দেখে বিমূঢ় হয়; অথচ অনেকেই সেখানে খেতে বসে গেছে! মুক্তির স্বাদ সে উপলব্ধি করতে চায় ঝিলের ধারের অবশিষ্ট পাখিগুলোকে দেখে – যেগুলো এখনো শিকারির জালে ধরা পড়েনি। যারা এতদিন মুক্ত জীবন কাটিয়েছে, তাদের

মনের অনেক অনুভূতি মরে গেছে; কিন্তু একদিন প্রতিবাদী ছিল যে লোকটি দীর্ঘ কারাবরণের পরেও তার হৃদয় বেঁচে থাকে।

'এখন কার পালা?' কবিতায় কবি বেদনার্দ্র কণ্ঠে বলতে বাধ্য হন : 'ঐ যে ঘাসের মধ্যে লাশ দেখছো/ সে একজন পিঁপড়ে।' অসহায় মানুষ বঞ্চনা আর শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়, কুশ্রী পোকামাকড় আর ময়লা মাছির সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য থাকে না। বধ্যভূমির প্রথম সারিতে নড়বড়ে শিশু, ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধ, শীর্ণ কিশোরী আর হতশ্রী যুবতীকে দেখতে পান কবি। কিন্তু কবিতার শেষে এসে সাহসী উচ্চারণ :

অবশেষে অস্ত্র প্রশ্ন করে,
এখন কার পালা?
তোমার না আমার।

['এখন কার পালা' : *খাঁচার ভিতর অচিন পাখি*]

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কাব্যগ্রন্থে কিছু ফিগারেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ (Figurative Language) প্রযুক্ত হয়েছে – আক্ষরিক অর্থকে ছাপিয়ে ভাষাকে ব্যঞ্জনাময়, চিত্রল ও তীক্ষ্ণ করে তোলার প্রয়াসে কবি সযত্ন :

দিন এবং রাত্রির অলিন্দে
পাতা ঝরার যতি চিহ্ন,
তুলোট কাগজে লেখা
পদাবলী ক্রমশ ধূসর।

['অশ্রুত পদাবলী' : *খাঁচার ভিতর অচিন পাখি*]

এই অস্থিরতা তাঁর এ-সময়ের কিছু কবিতাকে আক্রান্ত করেছে। বহির্জগত থেকে অন্তর্জগতে আত্মমগ্ন হতে দেখা যায় এসব কবিতায়। যে অপূর্ণতা ছিল ব্যক্তিজীবনে, সময়ের কশাঘাতে তা আর পূরণ হওয়ার সুযোগ পায় না। কবি অনুভব করেন, বাইরের বিশৃঙ্খল প্রতিকূলতা থেকে মুক্তি পেতে একাকীত্বে নিজেকে সমর্পণ করেও স্বস্তি পাওয়া যায় না; বরং জন-বিচ্ছিন্নতায় কবি আরও বেদানবোধ করেন :

তারারা সল্‌তে ছাড়া প্রদীপ
সকাল এখনো ঘুমিয়ে
আকাশ প্রায় নিঃসঙ্গ,
কালো এবং রক্তিমের চোরাবালিতে
শুভ্র নীল আটকে গেছে।

['একা একা পুড়তে থাকি' : *খাঁচার ভিতর অচিন পাখি*]

একজন কবির চেতনা ও বিশ্বাসের উত্তরণ তাঁর কাব্যসমূহের ধারাবাহিকতায় খুঁজে পাওয়া যায়। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কবিতায় এই ধারাক্রম স্পষ্ট। স্বদেশের প্রাকৃতিক রূপের স্নিগ্ধতা তাঁর কবিতায় কখনো ম্লান হয়নি; কিন্তু ব্যক্তিক ও সামূহিক যে স্বাধিকার চেতনা – তা ক্রমশ ক্ষীয়মান হয়েছে। তবে হতাশায় নিমজ্জনের মধ্যে তার পরিসমাপ্তি ঘটে না, নতুন স্বপ্ন ও আশা উত্তর-প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয় : বেদনার আর্তনাদের মধ্যেও আলোকোজ্জ্বল চাঁদ জেগে ওঠে।

৪

আমি এখন যাবার জন্য তৈরি
মৃত্যুর আগে
আমার পিতা যেমন
মুখ টিপে হেসেছিলেন
আমি তেমন প্রশান্ত
একমাত্র বিদায় নে'য়া ছাড়া
আমার কারুর সঙ্গে
কোনো সম্পর্ক নেই।

['আমি এখন যাবার জন্য তৈরি' : *আমার সকল কথা*]

একজন পূর্ণ মানুষই এমন সাহসী উচ্চারণ করতে পারে। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ বরাবরই উজ্জীবনের কথা বলেছেন – এই উজ্জীবন একইসঙ্গে বৈশ্বিক এবং আত্মিক। দিন বদলের আন্তরিকতায় তিনি কাব্যপ্রয়াসে নিবিষ্ট হন : কবিতার মধ্য দিয়ে প্রথমত তৈরি করতে চান আত্মসচেতনতা, এরপর তাকে জনজাগরণে রূপান্তরিত করতে চান। নিজের জীবনের দীপ্ত ও দৃপ্ত চেতনা পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করে তিনি বেঁচে থাকতে চান।

*কবিতা সমগ্র*র উৎসর্গপত্রে বলেছেন : 'আমার মৃত্যু হ'লে একটাই অনুরোধ/ জ্যোছনা আমার দেহ/ যেন ঘিরে থাকে'। সহস্র পাঠকের ভালবাসার জ্যোছনা তাঁকে ঘিরে রেখেছে।

টীকা

১. ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে *একুশে ফেব্রুয়ারী* সংকলন প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তা বাজেয়াপ্ত হয় ২০শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায়। ভাষা-আন্দোলনের শিল্পিত আবেগ-পুঞ্জকে সংরক্ষিত করার এই কর্মোদ্যোগ, নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ হাসান হাফিজুর রহমানের জীবনচেতনার এক গৌরবোজ্জ্বল প্রান্ত। দ্র. রফিকউল্লাহ খান, 'হাসান

হাফিজুর রহমান : প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি', *হাসান হাফিজুর রহমান রচনাবলী* প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৪, পৃ. ৭৬৭

২. 'মাগো, ওরা বলে' নামে কবিতাটি পরে ছাপা হয় *সাত নরী হার* কাব্যগ্রন্থে।

৩. মাত্র আঠার বছর বয়সে লেখা। দ্র. তারিক মনজুর, 'আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ'র কবিতায় স্বদেশ ও স্বাধিকার', সাহিত্য সাময়িকী, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১লা জুন ২০০১

৪. আহমেদ হুমায়ুন কর্তৃক গৃহীত আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর সাক্ষাৎকারের সূচনা অংশ, দ্র. দৈনিক বাংলা, ১৬ই নভেম্বর ১৯৯০

৫. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কবিতার আবৃত্তি-সংকলন 'তাম্রলিপি'। কাজী আরিফের কণ্ঠে রেকর্ডিং হয় ১৯৮৪ সালে। দ্র. কাজী আরিফ, 'সহিষ্ণু প্রতীক্ষার কথা তো আপনারই পংক্তি', *কিংবদন্তীর কথকতা*, আনিসুজ্জামান ও বেলাল চৌধুরী সম্পাদিত, সেন্টার ফর বাংলাদেশ কালচার, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২১৭-২১৯

৬. আহমেদ হুমায়ুন কর্তৃক গৃহীত আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর সাক্ষাৎকার, দ্র. দৈনিক বাংলা, ১৬ই নভেম্বর ১৯৯০

৭. সৈয়দ শামসুল হক, সন্তোষ গুপ্ত, ইকবাল আজিজ, দেবব্রত চক্রবর্তী বিষ্ণু, মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, দ্র. *কিংবদন্তীর কথকতা*, আনিসুজ্জামান ও বেলাল চৌধুরী সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. (পর্যায়ক্রমে) ৪১, ৬৫, ১৮৭, ২৩১, ২৩৭

৮. 'কেউ দেখে আর কেউ দেখে না।/ কেউ বা মৃদু হাসে/ আদর করে নেয় সে তুলে/ যে জন ভালবাসে।' দ্র. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, 'ভূমিকা', *কবিতাসমগ্র*, অনন্যা, ঢাকা, পৃ. ৭

৯. *একুশে ফেব্রুয়ারী* সংকলনে প্রকাশিত হাসান হাফিজুর রহমানের একটি কবিতা লক্ষ করা যাক – 'তাদের একজন আজ নেই/ না, তাঁরা পঞ্চাশ জন আজ নেই/ আর আমরা সেই অমর শহীদদের জন্যে/ তাঁদের প্রিয় মুখের ভাষা বাংলার জন্যে একচাপ পাথরের মতো/ এক হয়ে গেছি/ হিমালয়ের মতো অভেদ্য বিশাল হয়ে গেছি।' ['অমর একুশে' : *বিমুখ প্রান্তরে*] দ্র. *হাসান হাফিজুর রহমান রচনাবলী* প্রথম খণ্ড, রফিকউল্লাহ খান সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৪, পৃ. ২২

গ্রন্থপঞ্জি

আকতার কামাল, বেগম (১৯৯২)। *বিষ্ণু দে-র কবিস্বভাব ও কাব্যরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আহসান, সৈয়দ আলী (২০০১)। 'আধুনিক বাংলা কবিতা : ভূমিকা', *আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে*, গতিধারা, ঢাকা

ওবায়দুল্লাহ, আবু জাফর (১৯৯৯)। *কবিতা সমগ্র*, অনন্যা, ঢাকা

কাহালি, অনিবুদ্ধ (১৪০৭)। 'হাসান হাফিজুর রহমান : তাঁর ভিতরের বাঘ', *ভাষা-সাহিত্য পত্র*, সপ্তবিংশ বার্ষিক সংখ্যা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

খালেদ হোসাইন (২০০১)। 'আধুনিক কবিতা : পটভূমি প্রসঙ্গে', *আধুনিক বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গ*, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা

গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র (১৯৯৮)। 'শরদাগমে লোকের অবস্থা', *ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ*, মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

নজরুল ইসলাম, কাজী (১৯৯৩)। 'বিদ্রোহী', *অগ্নি-বীণা*, নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত (১৯৮৩)। 'চল্লিশের কবিতা', *আধুনিক কবিতার ইতিহাস*, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপধ্যায় সম্পাদিত, ভারত বুক এজেন্সী, কলিকাতা

মাওলা, আহমেদ (১৪০৪)। 'রফিক আজাদের কবিতা : শিল্পে ও স্বরূপে কালানুক্রমিক বিকাশের ধারা', বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা, ঢাকা

মান্নান সৈয়দ, আবদুল (২০০৩)। 'মোহনা জেগে ওঠা', *কিংবদন্তীর কথকতা*, আনিসুজ্জামান ও বেলাল চৌধুরী সম্পাদিত, সেন্টার ফর বাংলাদেশ কালচার, ঢাকা

মেনন, রাশেদ খান (২০০৩)। 'একজন স্বজনের কথা', *কিংবদন্তীর কথকতা*, আনিসুজ্জামান ও বেলাল চৌধুরী সম্পাদিত, সেন্টার ফর বাংলাদেশ কালচার, ঢাকা

শামসুল হক, সৈয়দ (২০০৩)। 'কবি মহৎ ওবায়দুল্লাহ', *কিংবদন্তীর কথকতা*, আনিসুজ্জামান ও বেলাল চৌধুরী সম্পাদিত, সেন্টার ফর বাংলাদেশ কালচার, ঢাকা